বাঙলা বানান-রীতি

জাফর সাদিক

ফ ফাতিহ প্রকাশন

বাঙলা বানান-রীতি

গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লেখক ও প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনমুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে বইয়ের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০২১

ISBN

লেখক: জাফর সাদিক

প্রকাশকঃ ফাতিহ প্রকাশন

ই-মেইলঃ fatihprokashon@gmail.com

পরিবেশকঃ আল ইখলাস পাবলিকেশন

৩৭,বিশাল বুক কমপ্লেক্স, নর্থব্রুক হল, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন : 01838-857631

মুদ্রণ ও বাঁধাই

প্রচ্ছদঃ মোহাম্মদ রাহীম আনোয়ার

মুদ্রিত মূল্য ১৪৩ টাকা

ফ ফাতিহ প্রকাশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস ১৩০০ বছর পুরনো। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলা ভাষার লিপি হল বাংলা লিপি।

বাংলা ভাষা (বাঙলা, বাঙ্গলা, তথা বাঙ্গালা নামেও পরিচিত) একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মাতৃভাষীর সংখ্যায় বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের পঞ্চম ও মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। বাংলা সার্বভৌম ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি ভাষা।

এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। এছাড়া ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মেঘালয়, মিজোরাম, উড়িষ্যা রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। ভারতে হিন্দির পরেই সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা বাংলা।

এই ভাষার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের ছাত্র সমাজ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্র ও আন্দোলনকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকরণের দাবিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষাকে যদি আমরা শুদ্ধভাবে পড়তে বলতে লিখতে চাই; তাহলে অবশ্যই নিয়মনিষ্ঠভাবে তার চর্চা না করে উপায় নেই। বাংলা ভাষাকে আমরা ভালোবাসি কিন্তু বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে পড়তে বলতে লেখতে আমরা আগ্রহী নই। অনেকে বাংলা ভাষাকে কঠিন ভাষা বলে আখ্যাত করে। আমি জানি না তারা বাংলা ভাষাকে কেন কঠিন ভাষা বলে আখ্যাত করে? কোনো ব্যক্তির জন্য শুভা পায়না তার মাতৃভাষাকে সে কঠিন ভাষা বলে আখ্যাত করবে। মাতৃভাষা থেকে সহজ অন্য কোন ভাষা হতে পারেনা। কারন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলে বেড়ে উঠে।

বাংলা ভাষা লেখাতে মানুষ বানানের ভুল বহুকাল আগে থেকে করে আসছে। বাংলা বানানের সমস্যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করলে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে বাংলা বানানের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি সমিতি পর্যন্ত গঠন করে ছিলেন।

লেখকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই সামান্য বইটি শেষ করার শক্তি দান করেছেন। তিনি চেয়েছেন বলেই এই অধমের দ্বারা বই লেখার কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে, নইলে তা হতো না। সেজন্যে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শুরুতেই বলে রাখা জরুরি যে, এটি কোনো ব্যাকরণের বই নয়, তবে ব্যাকরণের কিছু নিয়মকানুন নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক-পাঠিকার রুচি ও গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে ভবিষ্যতে এই বইয়ের কলেবর আরও বাড়তে পারে। এই বইটি ভাষাপণ্ডিতদের জন্যে নয়, যাঁরা ভাষা এবং ব্যাকরণ সমন্ধে অনেক জানেন; বরং এটি আমার মতো সাধারণ পাঠকদের জন্যে, যারা শুদ্ধভাবে লিখতে চান।

বইটি মাদরাসা-জেনারেল উভয়দিকের সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্যেই, তবে আমি বিশেষভাবে কওমি মাদরাসার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যেই বইটি লিখেছি, যারা বানানের ব্যাপারে খুব কম জানে বা যারা লিখতে গিয়ে বানানে ভুল করে, কিন্তু বানানের শুদ্ধচর্চায় তারা যথেষ্ট আগ্রহী। সাধারণত বাঙলাদেশের কওমি মাদরাসার পাঠক-পাঠিকারা বাঙলাভাষায় একটু বেশিই দুর্বল হয়। এর অন্যতম বড় কারণ হলো, স্কুল-কলেজে যতটা জোর দিয়ে বা যত বেশি বাঙলা পড়ানো হয়, ততটা জোর দিয়ে বা তত বেশি কওমি মাদরাসায় বাঙলা পড়ানো হয় না। আর এই দিকটা খেয়াল রেখেই আমি এই বইটি বিশেষভাবে তাদের জন্যে লিখেছি। তবে তার মানে এই নয় যে, এই বই কেবল তারাই পড়তে পারবে, বাকিরা পারবে না।

যেসব সাধারণ পাঠক-পাঠিকা লেখালিখি করতে চান, যেটুকু লিখব সেটুকু শুদ্ধ করে লিখব, মনের মধ্যে এমন প্রত্যয় বা বিশ্বাস লালন করেন, এই বইটি তাদের জন্যে সহায়ক হবে। ইন শা আল্লাহ। মনে রাখা উচিত যে, লেখালিখির জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হলো, শুদ্ধচর্চাকারী হওয়া। বানানভুল নিয়েও লেখক হওয়া যায়, তবে একজন ভালো লেখক বা সুলেখক হতে হলে অবশ্যই নির্ভুল বানানের অধিকারী হতে হয়।

আমরা যেহেতু জন্মের পর থেকেই আমাদের মাতৃভাষা বাঙলার সঙ্গে বেড়ে উঠি, তো সেই হিসেবে মাতৃভাষা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা না। তবু বিনাপরিশ্রমে যেহেতু কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়, সেজন্যে একটুখানি পরিশ্রম তো অবশ্যই করতে হবে। আর এই পরিশ্রমটা করতে হবে মাতৃভাষার প্রতি যথাযথ সম্মান ও ভালোবাসা রেখে। তাহলেই আশা করা যায়, আমরা বানানে নির্ভুল হতে পারব। আর তা হলেই আমার এই বই লেখার পেছনে যে শ্রম ব্যয় হয়েছে, তা সফল হবে; উপরন্তু আমার আত্মা ও মন শান্তি পাবে।

পরিশেষে বলতে চাই, বইটি আমি খুব যত্ন ও খেয়াল করে লিখেছি, যাতে ভুল-ত্রুটি না হয়। তবু মানব-রচিত কোনো বই-ই যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, সেই হিসেবে আমার বইয়েও আমার অজান্তে ভুল থাকতে পারে। যদি আমার লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে ভুল-

ত্রুটিগুলোর দায়ভার একান্তই আমার এবং সেগুলো চিহ্নিত করে আমাকে শোধরানোর অনুরোধ রইল, আর তা থেকে উপকৃত সব বিষয় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে।

‘ফাতিহ প্রকাশন’ খুব যত্নসহকারে বইটি প্রকাশ করেছে। প্রকাশক-, সম্পাদক-, প্রুফরিডার- এবং ডিজাইনারসহ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুক। আ-মীন।

সূচিপত্র

যুক্তবর্ণ	১০
হ্রস্ব-ই-কার এবং দীর্ঘ-ঈ-কার	১৪
হ্রস্ব-উ-কার এবং দীর্ঘ-ঊ-কার	১৭
ও-কারের কাজ	১৯
ক্রিয়াপদে বাড়তি ও-কার বর্জনীয়	২২
পাঁচ বর্গের পাঁচ ধরনের কাজ	২৩
ঙ এবং ং	২৪
ণত্ব বিধান	২৫
ষত্ব বিধান	২৭
‘স’-এর তিন রকম উচ্চারণ	২৯
য-ফলা, য-ফলা আ-কার এবং রেফ	৩০
আস্ত-ত এবং খণ্ড-ত	৩১
র বনাম ড়	৩৩
চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার	৩৫
এ, অ্যা এবং ঙ	৩৬
স্বত্ব, সত্ত্ব এবং সত্তা	৩৮
নির্দেশক একবচন ও বহুবচন শব্দ	৩৮
পাশাপাশি বহুবচনের দ্বিত্ব ব্যবহার বর্জনীয়	৪০
স্ত বনাম স্থ	৪০
কি বনাম কী	৪০
সমাপিকা বনাম অসমাপিকা	৪১
সর্বজনীন বনাম সার্বজনীন	৪২
চিৎকার বনাম শীৎকার	৪৩
ব্যবহার বনাম ব্যবহৃত	৪৩
পড়া বনাম পরা	৪৩
সমাসবদ্ধ পদগুলোয় ফাঁক রাখা বারণ	৪৪
অনুজ্ঞা (আদেশ-নিষেধ-অনুরোধ-উপদেশ)	৪৬
আগামী গত কাল ক্ষণ বিশেষ ভাবে মতে সহ ব্যাপী প্রতি	৪৭
কি না/কিনা, কেন না/কেননা, এমন কি/এমনকি/এমন কী, তার পর/তারপর	৪৮
তো কে বা গো রে	৪৯
শুধু-মাত্র	৫১
দিঙ্-নির্ণয়, দিগ্বিজয়, দিগ্বিদিক	৫১
রাতবেলা	৫১

বেশিভাগ ৫২
বাল ৫২
সেলিব্রিটি ৫২
সংগৃহীত ৫৩
বাহারি রঙের ফল ৫৩
অত্র এবং গিয়ে ৫৩
দিই-নিই, দেবে-নেবে, দেব-নেব, দেবেন-নেবেন ৫৩
কেন এবং কেনো ৫৪
পূরণবাচক শব্দের ভুল প্রয়োগ ৫৪
ফুলজাতীয় জিনিস এবং কলমজাতীয় পদার্থ ৫৭
আমি খাই, সে খায়, তুমি খাও ৫৮
অসম্ভব ৫৮
অংশদার ৫৯
লেখালিখি ৫৯
বাংলা বনাম বাঙলা ৫৯
না দিয়ে নানা কথা ৬০
সাধু ও চলিত ৬১
যতিচিহ্ন ৬৩
কুরআন মাজীদ ৬৬
আল্লাহ হাফীয ৬৬
ইন শা আল্লাহ ৬৬
হিসাব এবং গোসল ৬৭
আরবী-ভাষায় এ-কার বর্জন ৬৭
রমযান, ইফতার ও ইফতারি ৬৮
সেহরি এবং ফতোয়া ৬৯
সাদা, জিনিস ও মানুষ ৭০
সাহাবিরা, আলিমরা ৭০
আরবী-বাঙলা প্রতিবর্ণায়ননীতি ৭০
একজন ভালো লেখক হওয়ার জন্যে কী কী করতে হবে? ৭৫

কিছু পারিভাষিক শব্দ ও মাসয়ালা ৭৬

যুক্তবর্ণ

যুক্তবর্ণের আরেক নাম যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষর হচ্ছে একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি। বাঙলা-ভাষায় ব্যবহার হয় এমন অনেকগুলো যুক্ষাক্ষর উদাহরণসহ নিচে দেওয়া হলো:

ক

ক্ক = ক্ + ক; যেমন: ছক্কা, ধাক্কা, বৃক্ক (কিডনি), চিক্কণ (চিকন)।
ক্ত = ক্ + ত; যেমন: শক্ত, ভক্ত, রক্ত, সিক্ত।
ক্ব = ক্ + ব; যেমন: পরিপক্ব, অকালপক্ব।
ক্র = ক্ + র; যেমন: চক্র, বক্র, সক্রিয়।
ক্ল = ক্ + ল; যেমন: ক্লান্ত, ক্লাস।
ক্ষ = ক্ + ষ; যেমন: যক্ষা, রক্ষা, পক্ষ, দক্ষ।
ক্ষ্ণ = ক্ + ষ্ + ণ; যেমন: তীক্ষ্ণ (তীব্র)।
ক্ষ্ম = ক্ + ষ্ + ম; যেমন: সূক্ষ্ম, লক্ষ্মী।
ক্ষ্য = ক্ + ষ + য-ফলা; যেমন: অলক্ষ্যে, লক্ষ্যে।

খ

খ্য = খ্ + য অথবা খ-য়ে য-ফলা; যেমন: সখ্য।
খ্র = খ্ + র অথবা খ-য়ে র-ফলা; যেমন: খ্রিস্ট, খ্রিস্টান, খ্রিস্টীয়।

গ

গ্ণ = গ্ + ণ; যেমন: রুগ্ণ।
গ্ধ = গ্ + ধ; যেমন: দগ্ধ, মুগ্ধ।
গ্ন = গ্ + ন; যেমন: নগ্ন, লগ্ন (সংশ্লিষ্ট), ভগ্ন, মগ্ন।
গ্ন্য = গ্ + ন্ + য; যেমন: অগ্ন্যুৎপাত, অগ্ন্যাশয়।
গ্ব = গ্ + ব; যেমন: দিগ্বিজয়।
গ্ম = গ্ + ম; যেমন: যুগ্ম-সম্পাদক।
গ্র = গ্ + র; যেমন: গ্রাম্য।
গ্ল = গ্ + ল; যেমন: গ্লানি (অবসাদ)।

ঘ

ঘ্ন = ঘ্ + ন; যেমন: বিঘ্ন।
ঘ্র = ঘ্ + র; যেমন: সুঘ্রাণ।

হ্রস্ব-ই-কার এবং দীর্ঘ-ঈ-কার

১. বস্তুবাচক এবং ভাববাচক শব্দের শেষে ই-কার হয়। যেমন:

বস্তুবাচক : ঝুড়ি, ঘুড়ি, ঘড়ি, চুড়ি, শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি, কলসি, টুপি, চাবি, চিনি, চিরুনি ইত্যাদি।

ভাববাচক : দালালি, শয়তানি, ডাকাতি, চালাকি, হারামি, পাগলামি, সরকারি, মাস্টারি, জমিদারি, ডাক্তারি, মোক্তারি ইত্যাদি।

২. দেশ, ভাষা ও জাতির নামের ক্ষেত্রে সবসময় ই-কার হয়। যেমন:

দেশ : সিরিয়া, লিবিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ইতালি, জার্মানি, ব্রাজিল ইত্যাদি।

ভাষা : ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি/ফার্সি, ফরাশি, স্প্যানিশ, তুর্কি, নেপালি, ল্যাটিন, পর্তুগিজ ইত্যাদি।

জাতি : বাঙালি, খ্রিস্টান, মার্কিন, বিহারি, তুর্কি, ইরানি, গ্রিক, জাপানি ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : চীন, আরবী। ঈ-কারযোগে আরবী শুদ্ধ। আরবী বাঙলা-ইংরেজির মতো আর্যভাষা নয়, শেমীয় গোত্রের ভাষা। আরবী-ভাষার উচ্চারণ হবে যথাসম্ভব মূলের কাছাকাছি থেকে, আর এ ব্যাপারে কোনো মুসলমান অসতর্ক থাকতে পারে না।

৩. স্ত্রী-বাচক অ-তৎসম (সংস্কৃত নয় এমন) শব্দের শেষে ই-কার হয়। যেমন: মামি, দাদি, দিদি, নানি, চাচি, গিন্নি, কাকি ইত্যাদি।

৪. স্ত্রী-বাচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে সবসময় ঈ-কার হয়। যেমন: দাসী, নারী, ছাত্রী, নেত্রী, যুবতী, জননী, সুন্দরী, তরুণী, মানবী, স্ত্রী ইত্যাদি।

৫. তৎসম (সংস্কৃত) থেকে আসা বাঙলা শব্দে ই-কার হয়। যেমন: পক্ষী > পাখি, কুম্ভীর > কুমির, হস্তী > হাতি ইত্যাদি।

হ্রস্ব-উ-কার এবং দীর্ঘ-ঊ-কার

১. যেসব তৎসম শব্দের বানানে উ-কার এবং ঊ-কার অভিধানসিদ্ধ, সেসব বানানে এবং অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র) শব্দের বানানে সবসময় উ-কার ব্যবহার হয়। যেমন: ঘুড়ি, বুড়ি, ঝুড়ি, চুড়ি, ছুরি, মুড়ি, টুপি, খুশি, চুন, মুলা, পুজো, কুলো, পুব, ভুখা ইত্যাদি।

১. সর্বনাম অর্থে : এই অর্থে ‘ও’ সবসময় আলাদা বসবে, কেননা এখানে সে একাই আলাদা অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন: ও (আমাতুল্লাহ) আমার স্ত্রী হলে কী হবে, আমার অনুগত নয়। ও (আবদুল্লাহ) আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যে আমার বিপদাপদে সবসময় পাশে থাকে। ও (ছেলেটা) এতই বেয়াড়া যে, কারো কথাই কানে তোলে না।

এই ও-এর সঙ্গে যদি ‘কে’ যোগ করতে হয়, তবে ‘কে’ একসঙ্গে বসবে। যেমন: ওকে এত করে বললাম, তবু সে আমার কথা শুনে নি। ওকে বুঝিয়ে কোনো কাজ নেই, সে কারো কথাই বোঝে না। ওকে ভালো ডাক্তার দেখাও, নইলে পরে বড় বিপদ হয়ে যাবে।

২. সংযোজক অব্যয় অর্থে : এই অর্থেও ‘ও’ আলাদা বসবে।

যেমন: আনাস ও মালিক দু’জন সমবয়সী সহপাঠী। গোলাপ ও জবা আমার খুব পছন্দনীয় ফুল। নীলিমা লাল ও নীল রঙের চুড়ি পরেছে।

দ্রষ্টব্য : এখানে ও-এর স্থলে চাইলে ‘এবং’ বসানো যাবে।

৩. ভাববোধক অর্থে : এই অর্থে ‘ও’ সবসময় একসঙ্গে বসবে।

যেমন: কেবল রাশিদকেই নয়, আবিরকেও এখানে আসতে বলেছি। না না, কাজটা আমি একা করি নি, সেও করেছে। বড়লোকদের মতো আমাদেরও তো শখ থাকতে পারে।

ও-কারের আরো কিছু কাজ:

ক্রিয়াপদে বাড়তি ও-কার বর্জনীয়

নিয়ম বলে : সাধুতে যেসব ক্রিয়াপদের শেষাক্ষরে ও-কার ছিল না, চলিতেও সেসব ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার থাকবে না। ক্রিয়াপদটির চলিত রূপ কেমন হবে তা নির্ভর করে সাধু রূপে কেমন ছিল তার ওপর। অর্থাৎ, ক্রিয়াপদের সাধু রূপের শেষ অক্ষরে যদি ও-কার না থাকে, তো চলিত রূপের শেষ অক্ষরেও ও-কার থাকবে না। যেমন:

সাধু রূপ : করিল, ধরিল, বলিল, যাইল, আছিল, খেলিল, পড়িল, হাঁটিল ইত্যাদি।

চলিত রূপ : করল (করলো নয়), ধরল (ধরলো নয়), বলল (বললো নয়), গেল (গেলো নয়), ছিল (ছিলো নয়), খেলল (খেললো নয়), পড়ল (পড়লো নয়), হাঁটল (হাঁটলো নয়) ইত্যাদি।

ক্ষ : ক্ষণ, লক্ষণ, ভক্ষণ, রক্ষণ, সংরক্ষণ, বিচক্ষণ, পরীক্ষণ, ক্ষণকাল, ক্ষণিক, ক্ষীণ, অক্ষুণ্ণ ইত্যাদি।

৩. র, রেফ (র্), র-ফলা (্র), ঋ, ঋ-কার (ৃ), ক্ষ—এসব বর্ণের পর যদি য় হ-সহ ক-বর্গীয় (ক খ গ ঘ ঙ) এবং প-বর্গীয় (প ফ ব ভ ম) ধ্বনিসমূহের যেকোনো একটি থাকে, তবে পরবর্তী ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন: কৃপণ (এখানে ঋ-কারের পরবর্তী প হচ্ছে প-বর্গীয় ধ্বনি, কাজেই তার পরে ণ হয়েছে), গ্রহণ (এখানে র-ফলার পর হ এসেছে, তাই তার পরে ণ), শ্রবণ (এখানে র-ফলার পর ব হচ্ছে প-বর্গীয় ধ্বনি, তাই তার পরে ণ), একইভাবে গ্রামীণ (গ্রামজাত), অগ্রহায়ণ, রোপণ, চর্বণ, গৃহিণী, রক্ষিণী, অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ ইত্যাদি।

জেনে রাখা জরুরি যে, শিক্ষাঙ্গন, চিত্রাঙ্কন, বীরাঙ্গনা ইত্যাদি শব্দে মূর্ধন্য না হয়ে বরং দন্ত্য-ন হয়েছে। মূলত ব্যাকরণের বিশেষ নিয়মের কারণেই এমনটা হয়েছে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম শব্দ যে একেবারেই নেই, এমনটাও কিন্তু নয়। ব্যতিক্রম শব্দগুলো: নির্গমন, বহির্গমন, আয়ুষ্মান, চক্ষুষ্মান ইত্যাদি।

৪. স্বভাবতই ণ হয় এমন অনেক শব্দও আছে। যেমন: শাণ, শাণিত, লবণ, লাবণ্য, পণ, গণ, ঘুণ, গুণ, গুণী, গণ্য, গণক, গণিত, গণনা, তৃণ, কোণ, চিক্কণ, নিক্কণ, নিপুণ, কণা, ফণা, ফণী, মণি, বণিক, বাণিজ্য, পণ্য, পুণ্য, বীণা, বেণু, বাণী, বেণী, অণু ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান

মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের নিয়মই ষত্ব বিধান।

১. ট এবং ঠ বর্ণের সঙ্গে সাধারণত ষ যুক্ত হয়। যেমন:

ট : স্পষ্ট, কষ্ট, নষ্ট, তুষ্ট, ভ্রষ্ট, রাষ্ট্র, অনিষ্ট, বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট, আকৃষ্ট, আদিষ্ট, বিনষ্ট, বৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, দৃষ্টি, দ্রষ্টব্য ইত্যাদি।

ঠ : ভূমিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কাষ্ঠ, কোষ্ঠ, ওষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পৃষ্ঠা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

২. অ আ এবং অ-কার ব্যতীত অন্যান্য স্বরবর্ণ এবং সেসবের কারের পর অনেক ক্ষেত্রেই ষ ব্যবহার হয়। যেমন: বিদ্বেষ, বিশেষ, সুষম, বৈষ্ণব, উষ্ণ, উষা, এষা, এষণ, ভীষণ, ভূষণ, দূষণ, ওষুধ, ঔষধ, বিষয়, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : দেশ, বিদেশ, বিশ, সদৃশ ইত্যাদি।

৩. যদি ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত বিসর্গের পর ক, খ, প এবং ফ থাকে, তবে বিসর্গের স্থলে ষ হয়। যেমন:

ই-কারান্ত : নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ, আবিঃ + কার = আবিষ্কার, বহিঃ + কার = বহিষ্কার, নিঃ + ফল = নিষ্ফল ইত্যাদি।

উ-কারান্ত : চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ, চতুঃ + পার্শ্ব = চতুষ্পার্শ্ব ইত্যাদি।

আর যদি অ-কারান্ত এবং আ-কারান্ত বিসর্গের পর ক, খ, প এবং ফ থাকে, তবে বিসর্গের স্থলে ষ না হয়ে বরং স হয়। যেমন:

অ-কারান্ত : তিরঃ + কার = তিরস্কার, পুরঃ + কার = পুরস্কার, নমঃ + কার= নমস্কার ইত্যাদি।

আ-কারান্ত : ভাঃ + কর = ভাস্কর ইত্যাদি।

৪. রেফ, ঋ, ঋ-কার—এই ধ্বনিসমূহের পর ষ যুক্ত হয়। যেমন:

সর্বজনীন বনাম সার্বজনীন

সর্বজনীন মানে সকলের জন্যে কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক। যেমন: মুহাম্মদ সা. বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে সর্বজনীন নবী এবং রাসূল ছিলেন।

সার্বজনীন মানে সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ।

যেমন: আদি পিতা আদম আ. ছিলেন সার্বজনীন নবী।

চিৎকার বনাম শীৎকার

চিৎকার অর্থ চেঁচান, উচ্চ শব্দ ইত্যাদি।

যেমন: যখন কোনো অসৎলোক একজন মহিলাকে জোরপূর্বক ভোগ করতে যায়, তখন ওই মহিলা আত্মরক্ষার জন্যে যে উচ্চ শব্দ করে, তা-ই চিৎকার।

শীৎকার অর্থ শিহরণ।

তাছাড়া ‘বাঙ্গলা’ থেকে ভাষা হিসেবে আমরা অনুস্বর দিয়ে ‘বাংলা’ লিখলেও জাতি হিসেবে কখনোই অনুস্বর দিয়ে ‘বাংালি’ লিখি না। কারণ অনুস্বরের সঙ্গে কোনো কার যোগ হয় না। আর তাই উঁয়ো দিয়েই আমাদেরকে ‘বাঙালি’ লিখতে হয়।

না দিয়ে নানা কথা

‘না’-এর পাঁচ স্বজাতি আছে। যেমন: ‘নয়’, ‘নেই’, ‘নই’, ‘নাই’ ও ‘নি’। সবাই আলাদা বসবে। এক কথায়, নঞর্থক শব্দগুলো সবসময় আলাদা বসবে।

‘না’ দিয়ে উদাহরণ : করি না, করব না, ধরি না, ধরব না, পড়ি না, পড়ব না ইত্যাদি। ভুলেও করিনা, করবনা, ধরিনা, ধরবনা, পড়িনা, পড়বনা লিখবেন না—লিখলে ভুল হবে। আর এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ‘না’কে সবসময় আলাদা বসাবেন।

‘নয়’ দিয়ে উদাহরণ : সে নয়, কাজটা আমিই করেছি।
‘নেই’ দিয়ে উদাহরণ : আবদুল্লাহ বাড়ি নেই, এলেই খবরটা জানাব।
‘নই’ দিয়ে উদাহরণ : আমি নই, চুরিটা সে-ই করেছে।
‘নাই’ দিয়ে উদাহরণ : আমার নিকট এত টাকা নাই, আপনি বরং কর্তা সাহেবের নিকট খোঁজ করিয়া দেখিতে পারেন। (সাধু)

এতক্ষণ অবধি ‘না’-এর চার স্বজাতিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখনও কিন্তু আরেকজন বাকি আছে। এই আরেকজন হলো: ‘নি’। তাকে নিয়ে একটু গণ্ডগোল আছে। সে কারো কাছে আলাদা লেখার পক্ষে, আবার কারো কাছে একসঙ্গে লেখার পক্ষে। এক পক্ষের যুক্তি শক্তিশালী, অপর পক্ষের যুক্তি দুর্বল।

যারা আলাদা লেখার পক্ষে, তাদের দাবি নিম্নরূপ:
ক. যেহেতু ‘না’-এর অন্যান্য রূপগুলো আলাদা বসে, কাজেই নি-ও আলাদা বসাই উচিত এবং যুক্তিসঙ্গত।
খ. সাধুতে ‘নাই’ কখনোই একসঙ্গে অর্থাৎ পূর্বপদের সঙ্গে লেগে বসে না; বরং আলাদা বসে। সুতরাং চলিতে ‘নি’ও আলাদাই বসবে।

ব্যাপারটা উদাহরণের সাহায্য আরো খোলাসা করা যাক: আমরা কিন্তু সাধুতে কখনোই ‘খাইনাই’, ‘করিনাই’, ‘ধরিনাই’, ‘পড়িনাই’, ‘পরিনাই’ লিখি না; লিখি ‘নাই’কে আলাদা করে। অর্থাৎ, ‘খাই নাই’, ‘করি নাই’, ‘ধরি নাই’, ‘পড়ি নাই’, ‘পরি নাই’ লিখি। যেহেতু সাধুরূপে ‘নাই’ আলাদা বসে, তো চলিতরূপে ‘নি’ও আলাদা বসবে। কারণ সাধু রূপ ‘নাই’-এর চলিত রূপ ‘নি’। তাই লিখতে হবে—‘খাই নি’, ‘করি নি’, ‘ধরি নি’, ‘পড়ি নি’, ‘পরি নি’।”